Article (Non-Research)

প্রতিধ্বনি the Echo

A journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় অনুরূপা দেবী

রাজু লায়েক
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস, ভারত

Abstract

Anurupa Devi *(9th September 1882 – 19th April 1958) is one of the famous names in Bengali literature. She was a Bengali novelist, short story writer, poet and also a social worker. She was the women writers in Bengali to gain prominence. She was the daughters of Mukunda Mukhopadhyay. Bhudeb Mukhopadhyay was her grandfather.*

Up to the middle of nineteenth century the women of the Indian Society were deprived from education and they were restricted within house hold matters, they have no right to have basic education. It was for them, a social crime to become educated or achieved basic education. They had no equal right at the contemporary society as men had. Where women are going through these adverse conditions, the name Anurupa Devi appeared in the Bengali Literature as a representative of the women of that society.

১

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল ধরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে যিনি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা সমৃদ্ধ করে গেছেন, তথাকথিত স্কুল কলেজের গণ্ডির মধ্যে না গিয়ে গৃহ শিক্ষার দ্বারা নিজের আর্দশ ও জীবন গড়ে তুলে সমাজের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, সাহিত্যকে যিনি সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করেছেন, সাহিত্যের অর্থই যাঁর কাছে সমাজকে আনন্দ দেওয়া এবং পথ নির্দেশ করা, তিনি হলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুরূপা দেবী। তাঁকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম বলা যেতে পারে।

১২৮৯ বঙ্গাব্দের ২৪ ভাদ্র (১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে ৯ সেপ্টেম্বর) কলকাতার শ্যামবাজারে মামার বাড়িতে অনুরূপা দেবীর জন্ম হয়। তাঁর মাতামহ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অন্যদিকে তাঁর পিতামহ ছিলেন আদর্শবাদী স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। অনুরূপা দেবীর পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; তাঁর মাতা ধরাসুন্দরী দেবী ছিলেন সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিতা মহিলা। সাহিত্যক্ষেত্রে 'ইন্দিরা দেবী' নামে পরিচিত সুরূপা দেবী ছিলেন অনুরূপার অগ্রজা। যদিও

সাহিত্যক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার নিরিখে অবশ্য সুরূপার তুলনায় অনেক বেশি ছিল তাঁর কনিষ্ঠার (অনুরূপা দেবীর) খ্যাতি।

বাল্যকালে অত্যধিক শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনুরূপা দেবীর শিক্ষাজীবন (গৃহশিক্ষা) আরম্ভ হয় একটু দেরিতে। তিনি রোগশয্যায় থাকাকালীন অবস্থায় সময় কাটানোর জন্য অনুরূপার দিদি সুরূপা দেবী তাঁকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়ে শোনাতেন। এছাড়াও মুখুজ্যে বাড়ির নিয়ম অনুসারে প্রত্যহ ভূদেবের অবসর সময়ে তাঁর কাছে বসে বাড়ির শিশুদের রামায়ণ ও মহাভারতের একটি করে পালা শুনতে হত। এর ফলে মহাকাব্যের বিষয়গুলি খুব সহজেই অনুরূপা দেবীর আয়ত্ত হয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- 'নিরক্ষর থাকলেও আমি সেই বয়সে অশিক্ষিত ছিলাম বলা যায় না। কারণ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি আমি ভালোভাবেই জেনে নিতে পেরেছিলাম। তখন আমার বয়স সাত।' ('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প', অনুরূপা দেবী, সুশীল রায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৫) তাঁর দিদিরা পিতামহ ভূদেবের নিকট সংস্কৃত কাব্য পড়ে কবিতা লিখতে অভ্যাস করতেন। এভাবে তিনিও বাল্যকালে পিতামহ ভূদেব ও পিতা মুকুন্দ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শিশুকাল থেকেই লেখাপড়ার প্রতি অনুরূপা দেবীর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাংলা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষীদের গ্রন্থও তিনি অধ্যয়ন করতেন, ফলে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। একসময় তাঁর দিদি শ্বশুরবাড়ি থেকে রঙিন কাগজে পদ্যে পত্র লিখে পাঠান অনুরূপা দেবীকে। পদ্যাকারে পাঠানো অগ্রজার পত্র পড়ে তিনি বিব্রত হয়ে পড়েন এবং সমস্যার সমাধানের জন্য পিতামহের নিকট গেলে পিতামহ অনুরূপা দেবীকে বলেন 'এর উত্তর তোমাকে পদ্যেই দিতে হবে।' পিতামহের কথামত অনুরূপা দেবী সেই পত্রের উত্তর পদ্যেই দিয়েছিলেন-

পাইয়া তোমার পত্র পুলকিত হল গাত্র
আস্তেব্যস্তে খুলিলাম পড়িবার তরে।
পুঁথি গন্ধ পাইলাম কারুকার্য হেরিলাম
পুলক জাগিল অন্তরে।

('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প', পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬)

পদ্যাকারে দেওয়া এই পত্রই হল অনুরূপার সর্বপ্রথম রচনা। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যটি ছিল এইরূপ- 'এটা আমার মূল রচনা কিনা মনে পড়ছে না। সম্ভবতঃ পিতামহের হাতে সংশোধিত হয়ে এই আকার ধরেছিল। যাই হোক আমার জীবনের সর্বপ্রথম রচনা এইটেই।'

('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প', পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭৬)

অনুরূপা দেবীর প্রথম জীবনের রচনা সর্ম্পকে জানাতে গিয়ে সুশীল রায় জানিয়েছেন - 'তাঁর প্রথম লেখা গল্প কোন্ তিথি-তারিখে জন্ম নিয়েছিলেন তা তাঁর মনে পড়ে না। মার্কন্ডেয় চন্ডীর ও বাল্মীকি রামায়ণের আদি পর্বের পদ্যানুবাদ করেন দশ বছর বয়সের মধ্যেই। মহরম, দশহরা, দুর্গা পূজা নিয়ে ফরমায়েসী প্রবন্ধও লিখেছেন এবং এই সঙ্গে দু-চারটে গল্প- লেখার চেষ্টাও চলে। এইসব এলোমেলো প্রচেষ্টার মধ্যে থেকে একটি সর্ম্পূণ গল্প তিনি লিখে ফেলেন, তার নাম দেন 'সমাধি', কিন্তু সে-লেখা দিনের আলো আর দেখতে পায়নি, কখন কি ক'রে সেটা সমাধি লাভ করে তা আজ তাঁর মনে নেই।'

('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প', পৃঃ ১৭৬)

ভূদেবের সম্পাদনায় ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার' ও ১৮৬৬ খ্রিঃ 'এডুকেশন গেজেট' প্রকাশিত হত। বাড়িতে বই ও সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভাব ছিল না। এই কারণেই বাড়ির পরিবেশও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। একই সঙ্গে সমসাময়িক বিখ্যাত সাহিত্যিকদেরও যাতায়াত ছিল তাঁর পিতামহের কাছে। বলা যেতে পারে তাঁর সাহিত্য জীবনের ভিতটাই তৈরি হয়েছিল ভূদেবের আনুকূল্যে। স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে অনুরূপা দেবী সুশীল রায়কে জানিয়েছেন- 'আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে পিতামহের কথা। তাঁর সেই অনন্য সাধারণ দিব্যদীপ্ত মূর্তি, ধবলগিরি বা রজতগিরির মত শুভ্র উন্নত দেহে

বক্ষবিলম্বী ধবল শ্মশ্রু দেখলে লোক-পিতামহের প্রতিমূর্তিই মনে হত। তাঁর কাছে আমরা কত স্নেহ যে লাভ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। অত বড় কর্মী হয়েও সর্বদিক্‌দর্শী পিতামহদেব আমাদের শিক্ষার স্বাস্থ্যের সমস্ত খুঁটিনাটিটুকু পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতেন। বাড়িতে বিদ্বৎ সমাগমের শেষ ছিল না। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, উচ্চ ইংরেজ কর্মচারী, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত মহাদেব রাণাডে প্রভৃতি বর্মী শিখ কত বিদ্বান ও জ্ঞানীগুণীরা এসে আমাদের চুঁচুড়ার গঙ্গাধারের বাড়িতে বাস করতেন।' ('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প',পৃঃ ১৭৬) শুধু তাই নয়, তাঁদের চুঁচুড়ার বাড়িতে প্রতিবেশি হিসেবে পেয়েছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও। বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি সূত্রে কয়েকবছর সেখানে বসবাস করেন আর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর চুঁচুড়ার গঙ্গাধারের বাড়িতে হাওয়াবদলের জন্য প্রায় যেতেন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যের পৃষ্ঠভূমিতে প্রতিপালিতা হন অনুরূপা দেবী।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই ফাল্গুন মাত্র দশ বছর বয়সে হুগলীর উত্তরপাড়া নিবাসী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনুরূপা দেবীর বিবাহ হয়। শিখরনাথ সুপণ্ডিত ও শান্তস্বভাবের মানুষ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বিহারের মজঃফরপুর জেলাতে আইন ব্যবসা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিয়ের পর অনুরূপা দেবী স্বামীর নিকট ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও শিখরনাথ তাঁকে উৎসাহিত করে তুলতেন। অনুরূপা দেবী মজঃফরপুরে বসবাসকালে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং এখানেই তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাও পান। সেখানে বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথের কন্যা মাধুরীলতার সঙ্গে অনুরূপার প্রগাঢ় সখীত্ব হয়। মাধুরীলতার অকালমৃত্যুর পর অনুরূপাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-'তোমার দেখাদেখি ইদানিং গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিল, বেঁচে থাকলে হয়ত তোমার মতো লিখতে পারত .....।'('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প','মাধুরীলতা', শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, পৃঃ ১৯৮) রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই সাহিত্য জগতে অনুরূপা দেবীর সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

২

অনুরূপা দেবী বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। অগ্রজা ইন্দিরা দেবীর অনুপ্রেরণায় আরম্ভ হয় অনুরূপা দেবীর সাহিত্য-সাধনা। সাহিত্য জগতে অনুরূপা দেবীর প্রবেশ ছোটোগল্প রচনার মাধ্যমে, যদিও তাঁর 'সাহিত্যসম্রাজ্ঞী' আখ্যা ঔপন্যাসিক হিসেবেই। অনুরূপা দেবী মোট তেত্রিশটি উপন্যাস, অসংখ্য গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'মুক্তি' রাণী দেবী ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। গল্পটি ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে কুন্তলীন পুরষ্কারও পায়। অনুরূপা দেবীর প্রথম উপন্যাস 'টিলাকুঠী' প্রকাশিত হয় 'নবনূর' পত্রিকায় ১৩১১ বঙ্গাব্দে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মেয়েদের মধ্যে গল্প ও উপন্যাস লেখার রেওয়াজ খুব বেশি ছিল না। এর ফলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর মাসতুতো ভাই। তাঁরই মধ্যস্থতায় 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে অনুরূপা দেবীর পরিচয় ঘটে। এরপর তিনি ভারতী পত্রিকার লেখিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'বাগদত্তা'ও ভারতী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও তিনি অন্যান্য বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও নিয়মিত লিখতেন। তাঁর পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাসগুলি 'মন্ত্রশক্তি' (১৩২২), 'মহানিশা' (১৩২৩), 'মা' (১৩২৭) প্রভৃতি 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। তাঁর শেষ উপন্যাস হল 'বিচারপতি'। শেষ জীবনে আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেছিলেন তিনি, কিন্তু গ্রন্থটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। অসম্পূর্ণ সেই রচনাটির নাম-'জীবনস্মৃতি লেখা' (১৯৫২)। সাহিত্য জগতে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য

করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- ‘বাগদত্তা থেকে সব উপন্যাসই স্বর্ণকুমারী পিসিমার নির্দেশে লেখা হয়েছে। আগে প্লট ঠিক করে ধীর ধীরে মাস মাসে লেখা...তাঁরই উৎসাহে আমি লেখার দিকে নতুন প্রেরণা পাই।’ (‘অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প’, অনুরূপা দেবী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৬১) স্বর্ণকুমারী দেবী ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতার (বেলা) অবদানের কথাও তিনি বলেছেন- ‘আমার জীবন গঠনে যত লোকের সহায়তা আমি লাভ করিয়াছি, তার মধ্যে আমার প্রিয় বন্ধু মাধুরীলতার মূল্য নিতান্ত অল্প নয়!’ (‘অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প’, ‘মাধুরীলতা’, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, পৃঃ ১৯৫)। অনুরূপা দেবী কয়েকটি নাটকও রচনা করেছিলেন। দুটি বড় নাটক ‘বিদ্যারত্ন’ (১৯১৯) ও ‘কুমারিল ভট্ট’ (১৯২২) এবং চারটি ছোট নাটক একত্রে ‘নাট্যচতুষ্টয়’ (১৯৩৩) নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি বামাবোধিনী পত্রিকায় ‘অনুপমা দেবী’ ছদ্মনামে কবিতাও লিখতেন।
উপন্যাসের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের জগতে অনুরূপা দেবী ছোটগল্পকার রূপেও সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় আনুমানিক ২২/২৩টি উপন্যাস ছাড়াও চারটি ছোটগল্পের সংকলন- ‘রাঙ্গা-শাঁখা’, ‘প্রাণের পরশ’, ‘মধুমল্লী’ এবং ‘চিত্রদীপ’ প্রকাশিত হয়। অনুরূপা দেবীর অন্যান্য গল্পগ্রন্থগুলি হল- ‘উল্কা’ এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ‘ক্রৌঞ্চমিথুনের মিলনকথা’ ও ‘অনুরূপ দেবীর নির্বাচিত গল্প’(২০০২)। তাঁর ‘চিত্রদীপ’ গল্পগ্রন্থটি তাঁর দিদি ইন্দিরা দেবীকে, ‘প্রাণের পরশ’ গল্পগ্রন্থটি সুলেখিকা নিরুপমা দেবীকে, আর ‘রাঙা-শাঁখা’ গল্পগ্রন্থটি কল্যাণীয়া শ্রীমতি কল্পনা দেবীকে উৎর্সগ করা হয়েছে। তাঁর রচিত গল্পগুলি ভারতী, ভারতবর্ষ, সুপ্রভাত, জাহ্নবী, ভারত মহিলা, যমুনা প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হত।

অনুরূপা দেবী তাঁর গ্রন্থগুলির নামকরণ করেছেন কাহিনির মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে, যা অনেকাংশে সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, ও অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র। যা আমদেরকে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমে দিকের সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে সেই সময় সমাজে মেয়েদের অবস্থা কিরকম ছিল তার এক সার্বিক চিত্রও তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে তাঁর রচনা গুলি হয়ে উঠেছে তৎকালীন সমাজজীবন ও পরিবেশের জীবন্ত দলিল। এ যেন এক বাঙালি মেয়ের চোখ দিয়ে দেখা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাঙালি মেয়েদের বাস্তব জীবন কাহিনি।

এইদিক দিয়ে তাঁর রচিত পরাজয়, দেবদাসী ও উড়ো চিঠি প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষ অর্থবাহী হয়ে উঠেছে। ‘পরাজয়’ গল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় গল্পের নায়ক বিভূতি বাঙালি ভদ্রঘরের সন্তান। তিনি পেশায় ও নেশায় চিত্র শিল্পী। আর এই চিত্র শিল্পীর মডেল হিসেবে রয়েছে গল্পের নায়িকা রেবা চরিত্রটি। বিভূতি বড়লোকের ছেলে। গ্রামের ও শহরের অধ্যয়ন শেষ করে ইদানীং ললিতকলার সাধানায় মন দিয়েছেন তিনি। তাঁর বন্ধু প্রমথ দাক্ষিণাত্যে ভাস্কর শিল্প শিক্ষায় যশ অর্জন করেছেন। বিভূতি তাঁর বন্ধুর বাড়িতে মডেল হিসেবে পেয়েছে রেবাকে। মডেলকে সম্মুখে রেখে তিনি ললিতকলার সাধানা করেন। হঠাৎ নায়িকা রেবা বলে ওঠেন –‘আচ্ছা বিভূতিবাবু! তুমি বাড়ী গেলে ছবি আঁকা হবে কি ক’রে? অন্য ‘মডেল’ রাখবে?’ (‘অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প’, ‘পরাজয়’, পৃঃ ১৮) এ যেন বিভূতির অন্তরের প্রশ্ন। বিভূতি তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু রেবার প্রশ্ন পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনরা জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে সে। প্রশ্নের উত্তরে বিভূতিবাবু হঠাৎ বলে ওঠেন- ‘বল্‌বো, রেবা আমার স্ত্রী, আমি ওকে বিবাহ কর্‌বো ব’লে নিয়ে এসেছি।’ (‘পরাজয়’,পৃঃ ১৮) উত্তরটি হয়তো রেবাও কল্পনা করতে পারেননি। রেবা দরিদ্র, মারাঠি ব্রাহ্মণ কন্যা। তাঁদের এই মিলন হিন্দুসমাজ ও বিভূতির বাড়ি লোকেরা কখনোই গ্রহণ করবে না। কিন্তু বিভূতি তাঁর প্রেমে অটল সে দরিদ্র, মারাঠি ব্রাহ্মণ কন্যার জন্য দেশের বাড়ি ত্যাগ

করতে ও সমাজ চ্যুত হতেও রাজি। কিন্তু বিভূতির বন্ধু প্রমথ রেবাকে বলে যে, এই বিবাহে বিভূতির 'ভারি ক্ষতি হবে, ওর মা কাঁদবে, সকলে ওকে ত্যাগ করবে,- তবু তুমি ওকে বিয়ে করবে?' ('পরাজয়',পৃঃ ২১) সমাজ চ্যুত হওয়ার কারণ হল রেবা গরীব মারাঠির মেয়ে আর বিভূতি বাঙালি ভদ্র ঘরের সন্তান। আর গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়-'এই ব্যাথিত, কুণ্ঠিত ও অপমানিত 'মডেল' রেবার ত্রিগুণাতীতা-য় উত্তরণ, হিন্দু শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন ও শাস্ত্রীয় তর্কযুদ্ধে জয়লাভ, সার্থকভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। এ যেন নারীর নিজের ভাগ্য নিজেই জয় করা- সমাজের নিষ্ঠুর কদর্য তার উর্দ্ধে উঠে নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই গল্পে মডেলের জীবনের সামাজিক অবমাননার কথা যেমন আছে, তেমনি সেই সমাজের মধ্যে থেকেই নিজের প্রচেষ্টায় নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার জয় ধ্বনিত হয়েছে।' ('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প', ভূমিকা অংশ, অনুরাধা চন্দ, পৃঃ ১০) এ প্রসঙ্গে অনুরূপার 'দেবদাসী' গল্পটির কথা উল্লেখ কর যেতে পারে। এখানে তিনি সমাজের আর এক বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন। গল্পের নায়িকা হলেন বিশোকা দেবদাসী। 'দেবদাসী দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিতা। এ পৃথিবীর সহিত তাহার কোন রূপ সম্পর্ক পাতানো চলে না। সে কাহারও কন্যা নয়, বনিতা বা মাতা, - কিছু সে নয়, শুধু সে দেবদাসী ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয়।' ('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প', 'দেবদাসী', পৃঃ ৯৭) বিশোকার বয়স যখন আট বছর তখন সে -'পুষ্পমাল্যভূষিতা বালিকা বিগ্রহ-কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া আপনাকে দেব-চরণে উৎসর্গিতা করিল।' (দেবদাসী, পৃঃ ৯৯) আর আজ থেকে সে জানিলো -'পিঙ্গলেশ্বর আমার স্বামী।' (দেবদাসী, পৃঃ ১০৫) ত্রিণাবেলীর সুপ্রসিদ্ধ পিঙ্গলেশ্বর মন্দিরের সে ষষ্ঠ দেবদাসীর স্থান অধিকার করে। তার একমাত্র কর্ম সে- 'বিচিত্র আঙ্গিয়া ও ফিরোজী ওড়না পরিয়া ঠাকুরের নাট-মন্দিরে নাচিতে যায়।' (দেবদাসী, পৃঃ ১০০) এই অন্ধবিশ্বাস নিয়ে সে যখন ধীরে ধীরে তেরো বছর বয়স পূর্ণ করে নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী তখন একদিন সন্ধ্যা বেলায় রাজাধিরাজ উৎপলাদিত্য তাঁকে সাবধান করে দেন- 'এ দেবমন্দির পুণ্যভূমি সন্দেহ নাই, - কিন্তু দেবদাসীর পক্ষে তাহার জীবনটাকে পবিত্র রাখা একান্তই সুকঠিন। দেবদাসী, নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে তাহার মন্দিরেরই পুরোহিত যাজক গণের সেবিকা।' (দেবদাসী, পৃঃ ১০৩) বিশোকাকে অন্ধকারে রাজার সঙ্গে কথা বলতে দেখে মন্দিরের পুরোহিত সদাশিব দেশপান্তর মনে হয় রাজা হয়তো মধুলোভের আশায় এসেছিলেন। তাই পুরোহিত সদাশিব সরাসরি জানিয়েদেন-' মন্দির-সেবিকা রাজার জন্য নয়। এ দুরাশা তাঁকে ত্যাগ করিতেই হইবে, আর তুমিও ইহা ত্যাগ কর, রাজরাণী হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।' (দেবদাসী, পৃঃ ১০৫) কারণ দেবদাসীরা হলেন দেবতার দাসী আর পুরোহিত হলেন দেব প্রতিনিধি সমস্ত দেব-সম্পত্তিতে একমাত্র তাঁরই অপ্রতিহত অধিকার। তাই বিশোকাও তাঁরই সম্পত্তির মধ্যে পড়ে। তাঁকে ভোগ করার ক্ষমতা একমাত্র পুরোহিতেরই আছে, এখানে রাজার কোন অধিকার নেই। বিশোকা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে মন্দিরের পুরোহিত সদাশিব দেশপান্ত চরম সত্যটি তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত করেন- 'চিরকালই এই প্রথা, - দেবদাসী মাত্রেই চিরদিন ধরিয়া পুরোহিতেরই সম্পত্তি - একথা কে না জানে?' (দেবদাসী, পৃঃ ১০৬) বিশোকার দৈবের প্রতি সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সে উপলব্ধি করে- 'সে দেবতার নহে, শুধু দেবনামে উৎসর্গিতা মানবের ক্রীড়া দাসী মাত্র।' (দেবদাসী, পৃঃ ১০৭)

অনুরূপা দেবীর 'উড়ো চিঠি' গল্পে নারীর ব্যক্তিসত্তা, আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের আসাধারণ প্রকাশ ঘটেছে। ইন্দ্রনাথের প্রতিবেশী যোগীন মল্লিক ও তাঁর স্ত্রী শৈলবালার দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন- 'সোহাগ এবং নির্যাতন যেন একত্র হাত-ধরাধরি করিয়া তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতেছে।' ('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প', 'উড়ো চিঠি', পৃঃ ৬৩) এদের দাম্পত্য জীবনে দেখা দিয়েছে পারিবারিক হিংসা। প্রায় প্রতিদিন

রাত্রে মাতাল স্বামী যোগীন স্ত্রী প্রহার করতে ছাড়ে না। কিন্তু শৈলবালা শুধু মার খেয়ে যায়, এর প্রতিবাদ কোনো দিনই করে না। একদিন রাত্রে শৈলবালা যখন প্রহৃত হচ্ছে, তার করুণ চিৎকার সহ্য করতে না পেরে ইন্দ্রনাথের পত্নী তখন এর বিরুদ্ধে ইন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ করতে বললে ইন্দ্র বলে ওঠে-'স্বামী যখন স্ত্রীকে প্রহার করে, সে সময়ে বাধা দিবার কোন অধিকারই তো আর অন্য প্রতিবেশীদিগের নাই, বরং জোর করিয়া বাড়ী ঢুকিতে গেলে ট্রেস্‌পাসের নালিশ চলে।' ('উড়ো চিঠি', পৃঃ ৬৩) আর এই ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর ভূমিকাটি হয় 'কাজেই পাঁঠা-বলি দেখার মত করিয়াই তাঁদের উহা সহ্য করিতে হয়'। ('উড়ো চিঠি', পৃঃ ৬৩) ইন্দ্রের আর একটি বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সাধারণ পুরুষ চরিত্রের ছবিটিও পরিষ্কার দেখা যায়- 'ওর স্বামীর ওকে মারবার, কাটবার, সব করার অধিকার আছে।.....সংসারের এই রকমই হয়ে থাকে, স্বামী খেতেও দেয়, আবার মারেও দু'ঘা, -স্ত্রীরা চিরদিন এসব সহ্যও করে যায়, এ কিছুই বিচিত্র নয়। এইসব আর্দশ ছিল বলেই দেশটা ঠাণ্ডা ছিল। এখন এই তোমাদের মতন তার্কিক মেয়ে জন্মে, দেশের আর্দশটা নষ্ট করে ফেলেচে।' ('উড়ো চিঠি', পৃঃ ৬৩-৬৪) এভাবে মাতাল স্বামীর স্ত্রীকে প্রহার করা দেশের আর্দশ হয়ে উঠেছে, আর এই প্রহার যেন দেশের পক্ষে অনুকূল। আর এই সব কান্ড দেখে গল্পের নায়িকা ও ইন্দ্রনাথের মেয়ে অমিয়ার মনে হয়েছে- 'এর নাম আর্দশ স্ত্রীত্ব? মাতাল স্বামী মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিলেও পাড়া-প্রতিবেশী বাধা দিবার অধিকার নাই; এবং স্ত্রীরও এমন ক্ষমতা নাই যে, এই অন্যায় অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচে? দাসত্ব-প্রথা আর এর চেয়ে বেশি কি কঠোর ছিল।' ('উড়ো চিঠি', পৃঃ ৬৪) একই সঙ্গে অমিয়া সমাজের কাছে প্রশ্ন রেখেছে- 'যেমন পুরুষরা অসতী বর্জন করে চলে, মেয়েদের বেলাও সেরকম বিধান থাকা কি অসঙ্গত?' ('উড়ো চিঠি', পৃঃ ৮৪)

অনুরূপা দেবী প্রায় প্রতিটি রচনাতেই সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও সেই সঙ্গে নারীদের বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর রচনার মধ্যদিয়ে নারীর সমস্যা সমাধানের পথও দেখাতে চেয়েছেন। আর সেজন্য তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলিও ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্ট নায়িকারা শুধু হিন্দুসমাজের সতীত্বে বিশ্বাসী নয়, বরং নিজ ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠতে চেয়েছে। তৎকালীন বাঙালি সমাজ ও সমাজের মনোভাব যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছিল তা তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে সহজে অনুমান করা যায়। অনুরূপা দেবীর সৃষ্ট নারীর চরিত্র সম্পর্কে অনুরাধা চন্দ যর্থাথই বলেছেন- 'অনুরূপার লেখায় নারীত্বের দুটি প্রকাশ পাশাপাশি পাওয়া যায়- নারীর চিরন্তনী রূপ, আবার নারীর ব্যক্তিসত্তা, আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের আসাধারণ প্রকাশ। এই দুই গুণের সমাবেশেই অনুরূপার আর্দশ নারী। সে একদিকে যেমন ত্যাগের মহত্ত্বে মহিয়সী, তেমনি চরিত্রের দৃঢ়তায় সে কঠোর। ধর্ম ও সমাজের বাইরে না গিয়েও সে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করে, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।' ('অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প', ভূমিকা অংশ, পৃঃ ১২) ভারতীয় সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ সচেতনতাও লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচনাগুলির মাধ্যমে।

অনুরূপা দেবী শুধুমাত্র লেখিকা ছিলেন না, তিনি একজন সমাজ সেবিকাও ছিলেন। মজঃফরপুরের বসবাস কালে তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার সঙ্গে চ্যাপম্যান গার্লস স্কুল নামে মেয়েদের একটি স্কুল স্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ভারগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বারাণসীর হিন্দু-মহিলাশ্রম, আর্য-বিদ্যালয়, মাতৃমঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যক্ষা পদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কলকাতার বাণীপীঠ নারী কল্যাণ-আশ্রম, হিন্দু-মহিলাশ্রমের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। সমাজসংস্কারে, বিশেষত নারীকল্যানার্থে তাঁর যোগদান ও ভূমিকা প্রশংসনীয়। অনুরূপা দেবী জনকল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৪ এর ১৫ জানুয়ারির বিহার ভূমিকম্পে নিজে গুরুতরভাবে আহত হয়েও বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য করার জন্য কল্যাণব্রত

সংঘ স্থাপন করেন এবং নিজের চেষ্টায় বিপদগ্রস্থ মানুষদের চিকিৎসা, অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীভারত মহামণ্ডল তাঁকে 'ধর্মচন্দ্রিকা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে থেকে তিনি কয়েক বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এ পরীক্ষার বঙ্গসাহিত্যের প্রশ্নপত্রের রচয়িত্রী ও পরীক্ষক মণ্ডলীর সদস্যা ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি দান করেন। এছাড়াও তিনি 'ভারতী', 'রত্নপ্রভা' উপাধিতে ভূষিতা হয়েছিলেন। ১৯৩৫ ও ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' ও 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। ১৯৩১-৩৮ এই কয়েক বছর অনুরূপা দেবী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের মূল ও শাখা সভাপতির পদটি অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'লীলা লেকচারার' নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল সমাজ ও সাহিত্যে নারী। তাঁর এই বক্তৃতার বিষয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'অনুরূপা দেবীঃ সাহিত্যে নারী- স্রষ্টা ও সৃষ্টি' নামে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যে একটি অনবদ্য গ্রন্থ বলা চলে। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'সাহিত্যভারতী' উপাধি লাভ করেছিলেন।

বিহারের ভূমিকম্পে তাঁদের মজঃফরপুরের বাসগৃহ ভূমিসাৎ হয়। ভূমিকম্পে তাঁর দশ বৎসরের পৌত্রী অরুণা মারা যায় এবং তিনি নিজেও আহত হন। এরপর শোকাকুলা অবস্থায় স্বামীপুত্র সহ কলকাতায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এরপর কিছুদিন তিনি পৌত্রের কর্মস্থল রানীগঞ্জে বাস করেন। ৬ বৈশাখ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে (১৯ এপ্রিল ১৯৫৮) শনিবার তিনি করোনারি থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় ছোট ভগ্নীর গৃহে লোকান্তরিত হন।

অনুরূপা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং প্রায় অর্দ্ধশতকের বেশি সময় ধরে তিনি সাহিত্যসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৯৫৮ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি লেখালেখি করেগেছেন। তাঁর লেখনীর জোরে আজও তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

সহায়ক-গ্রন্থ ও পত্রিকা :-
১। চন্দ অনুরাধা, অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২
২। চন্দ অনুরাধা, অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প (ভূমিকা অংশ), কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২
৩। রায় সুশীল, মনীষী জীবনকথা, কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৬৩
৪। ভট্টাচার্য গৌরীশঙ্কর, অনুরূপা দেবী, কলকাতা : দেশ, ২৫ বর্ষ : ২৭ সংখ্যা, ১৯৫৮
৫। দেবী অনুরূপা, মাধুরীলতা, কলকাতা প্রবাসী : পৌষ সংখ্যা, ১৩৪৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ-
১। অধ্যাপিকা ব্রততী চক্রবর্তী
২। বিউটি কর্মকার